চীন
বন্ধু নয়!

শাইখ উসামা মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ

চীন বন্ধু নয়!

মূল:

শাইখ উসামা মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ

ভাষান্তর:

আব্দুল্লাহ আজমী

وطن عزیز میں کمیونسٹ چین کے نفوذ کے تناظر میں

داعیان دین پاکستانیوں کو مخاطب تحریر۔

কমিউনিস্ট চীনের পাকিস্তানে অনুপ্রবেশ পর্যালোচনায়,

পাকিস্তানী দায়ীগণের সমীপে লেখা চিঠি।

আল্লাহর শপথ! আমরা সিরিয়াতে যুদ্ধ করি বা আফগানিস্তানে... ফরজ তো আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা এখন কি করব? ধৈর্যের বাধ যে ভেঙ্গে গেছে! ওয়াল্লাহি, অত্যাচারের সীমা অতিক্রম হয়ে গেছে! ইসলামকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে! হ্যাঁ! ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যুবকদের দিয়ে জেল পরিপূর্ণ করা হয়েছে। বাবার সামনে মেয়ের ইজ্জত লুণ্ঠন করা হয়েছে! আর কত! আর কত ধৈর্য ধরব? আল্লাহর শপথ! তুর্কীস্তানের মা-বোনেরা আমাদের অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছে! কিন্তু আমরা!.. আমরা এখনো এখানে...

কবে যাব? কবে তাদেরকে জালিমের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করব?

মেনে নিলাম বর্ডার কঠোর নিরাপত্তায় নিয়ন্ত্রিত, ক্রসিংয়ের সকল রাস্তাঘাট বন্ধ। কিন্তু আল্লাহর কসম! তবুও রাস্তার সন্ধান মিলবে! নিঃসন্দেহে মিলবে! আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সাহায্য করবেন। যেভাবেই হোক আমাদেরকে তুর্কীস্তানে প্রবেশ করতেই হবে। বলুন এখন আমরা কি করব?

কথাগুলো ২২/২৩ বছরের এক টগবগে যুবকের। পূর্ব তুর্কীস্তানী মুহাজির। চীনাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রথমে হিজরত করেন সিরিয়াতে। চার বছর সেখানে অবিরাম জিহাদ চালিয়ে যান। তারপর চলে আসেন আফগানে। বর্তমানে তিনি ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তত্ত্বাবধানে এখানেই জিহাদরত আছেন। চেহারা তার পবিত্র নূরে উজ্জ্বল! দৃষ্টিভঙ্গিতে ঈমানের উষ্ণতা! আর হৃদয়ে পাহাড়সম মনোবল!

লজ্জাশীলতা যেন চেহারা দিয়ে টপকিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পরছিল। আমাদের সামনে অবনত দৃষ্টিতে বসে বসে মাটিতে দাগ কাটছিল। হঠাৎ করে হৃদয়ের গভীর থেকে একটা 'আহ্' বলে উঠল। যেন সেই 'আহ্' টি ছিল শত-সহস্র কষ্ট মিশ্রিত এক আহ্!...

তারপর নিজেকে সম্বোধন করেই উপরের এই কথাগুলো বলে গেল।

আমরা তাকে উত্তম সময়ের অপেক্ষা করতে, নিজ জামা'আতের সাথে জড়িয়ে থাকতে, আমীরদের উপর ভরসা করা এবং জিহাদের ময়দানে অটল অবিচল থাকার উপদেশ দিলাম। অতঃপর তাকে বুঝাতে বুঝাতে একপর্যায়ে তার পিতা-মাতা সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তাদের সাথে সর্বশেষ সাক্ষাৎ কবে হয়েছিল?

উত্তরে যা বলল তা রীতিমতো হতবাক করে দেওয়ার মত! বলল, 'আমার পিতা-মাতা এবং আমার যুবতী বোন সকলেই জেলে আছে'। জিজ্ঞেস করলাম, 'কবে থেকে?' বলল, 'চার বছর যাবত'। এই কথাগুলো সে এমন দুঃখ কষ্টের সাথে বলতেছিল যে, স্বয়ং আমার নিজের চোখটাই পানিতে ভরে গেল। সে বলল, 'এমন ঘটনা শুধু আমার একার নয়! বরং আমাদের পুরো জাতিই এইরকম সময় অতিক্রম করছে'।

পূর্ব তুর্কীস্তানে ইসলামের কি অবস্থা? এখানকার মুসলমানেরা কীভাবে দিনযাপন করছে? তার সামান্য ধারণা আমার আগে থেকেই ছিল। তুর্কীস্তানী মুজাহিদদের সাথেও একটু সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এটাই ছিল প্রথমবার যে, এ সকল মুজাহিদদের সাথে সরাসরি কথা বলে সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হলাম।

পূর্ব তুর্কীস্তানের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করা এবং তার উপর ভিত্তি করে আমার পাকিস্তানি দ্বীনদার ভাইদের সমীপে কিছু আবেদন ও নিবেদন তুলে ধরাই হলো আজকের মূল উদ্দেশ্য।

প্রথমে আমরা পূর্ব তুর্কীস্তান এবং সেখানকার মুজাহিদদের সংক্ষিপ্ত অবস্থা তুলে ধরব। যাতে করে সামনের আলোচনা বুঝতে সহজ হয়।

এই জায়গাটি মিডিয়া জগতে 'জিঞ্জিয়ান' নামে পরিচিত। এটি ওই ভূখণ্ডের আসল নাম নয়। এ নামটি অবৈধ দখলদার চীনের পক্ষ থেকে দেওয়া। মূলতঃ তার আসল নাম হলো 'পূর্ব তুর্কীস্তান'। এটি ৩৫ মিলিয়ন মুসলমানের একটি বিস্তৃত ভূখণ্ডের নাম।

আয়তনের দিক থেকে এটি পাকিস্তানের চেয়েও বড়। কেননা জিঞ্জিয়ান (পূর্ব তুর্কীস্তান) হলো বর্তমান চীনের মোট আয়তনের এক-পঞ্চমাংশ। যা আয়তনে পাকিস্তানকেও অতিক্রম করে। এখানকার বংশ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, চাল-চলন, রীতি-নীতি, ঐতিহ্য ও ইতিহাস এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এখানে বসবাসকারীদের ধর্ম চীনাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেন দুইটার অবস্থান পৃথিবীর দুই মেরুতে। কেননা চীনাদের সংস্কৃতি হলো ধর্মদ্রোহিতা, দ্বীনের সাথে শত্রুতা। আর তাদের স্বভাব-চরিত্র হলো নিকৃষ্ট হিংস্র প্রাণীর মতো। অথচ ইসলাম এর সম্পূর্ণ বিপরীতে। ইসলামে রয়েছে আল্লাহর ইবাদত ও তার বন্দেগির ফরমান। প্রিয় রবের সাথে সু-গভীর সম্পর্ক ও মোহাব্বতের প্রেরণা। সাথে সাথে রয়েছে আল্লাহ ও তার রাসূলের দুশমনদের প্রতি মন ভরা ঘৃণা।

মূলতঃ এখানেই ছিল উইঘুর জাতির বসবাস। যাদের ভাষা ছিল চীনাদের থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। এই উইঘুরী ভাষার বর্ণমালাও চীনা বর্ণমালা নয়, বরং আরবি বর্ণমালা ছিল। এখানকার ইতিহাস যদিও বর্তমানে চীনের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানকার ইতিহাস ইসলামী রাজ্যের সাথে সম্পর্কিত। এখানকার রাজধানীর নাম হলো 'কাশগর'। এই শহরটি আমাদের মাঝে কবি ইকবালের কারণেই বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করে। আল্লামা ইকবাল একসময় মুসলিমদের মাঝে ঐক্য ও ইসলামের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একটি কবিতা বলেছিলেন। যেখানে কাশগরের মুসলমানদের কথা বিশেষ ভাবে তিনি উল্লেখ করেছিলেন।

ইকবাল বলেন:-

ایک ھو مسلم حرم کی پاسبانی کیلی.

نیل کي ساحل سی لیکر تابه خاک کا شغر.

সকল মুসলিম ঐক্যবদ্ধ হও হেরেমের রক্ষার জন্য,

নীল-নদের তীর হতে নিয়ে কাশগরের মৃত্তিকা পর্যন্ত।

আজ কাশগরের মুসলমানদের উপর চলছে অমানুষিক জুলুম আর নির্যাতন, কিন্তু প্রিয় মাতৃভূমি আজ নীরব! (এই নীরবতাটাই যেন ইকবালকে জাতীয় কবির পরিবর্তে জাতীয়তাবাদের কবি বানিয়ে দিচ্ছে!..)

হিজরি প্রথম শতাব্দীতে কুতাইবাহ বিন মুসলি বাহেলী (রহ.) এই কাশগর শহরটি জয় করেন। এই শতাব্দীতেই ইসলাম পুরো তুর্কীস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। আলোকিত হয়ে ওঠে পুরো তুর্কীস্তান। অতঃপর এখানকার মুসলিমরাই দাওয়াতের এই ফরজ দায়িত্ব আদায় করতে থাকেন। তাদের এই দাওয়াতি কার্যক্রমের আলোকধারা এমনকি চীনের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। চীনারা যখন সর্বপ্রথম ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে এই ভূখণ্ডের উপর দখলদারিত্ব কায়েম করে, তখন এদেশের মুসলিমরা তাদের এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে তুলেন। শাহাদাত বরণ করেন লক্ষ লক্ষ মুসলিম। তবেই সফল হয় এই আন্দোলন। বিজয় ছিনিয়ে আনেন মুসলিমরা।

দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয় দখলদার চীনাদেরকে। অতঃপর কায়েম করা হয় ইসলামী হুকুমত। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই চীনারা আবারো আক্রমণ করে বসে পূর্ব তুর্কীস্তানে। শুরু হয় তীব্র লড়াই। এই লড়াই দীর্ঘদিন ধরে চলে। এক পর্যায়ে ১৮৬৫ সালে ইয়াকুব বেক রহ. চীনাদেরকে হটিয়ে দেন। পুনরায় দেশকে স্বাধীন করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর তিনি পূর্ব তুর্কীস্তানকে খেলাফতে উসমানিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করার ঘোষণা দেন। পরবর্তী বেশ কয়েক বছর এই ভূখণ্ড খেলাফতে উসমানিয়ার সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

১৯৪৮ সালে মাও সে তুং যখন চীনের ক্ষমতায় আসে, তখন সে পুনরায় তুর্কীস্তানের উপর আক্রমণ করে বসে। নতুনভাবে পুরো তুর্কীস্তান জুড়ে জুলুম ও নির্যাতনের এক কালো অধ্যায়ের সূচনা করে। কমিউনিস্ট চীনা সরকার এই আগ্রাসনে ৩৫ লক্ষ মুসলিমকে শহীদ করে দেয় (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিয়ুন)।

মাও সে তুং-এর শুরু করা এই জুলুম ও নির্যাতনের ধারা পুরো পূর্ব তুর্কীস্তান জুড়ে অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে। যা আজ জুলুমের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে এবং ধৈর্যের বাধ উপরে ফেলেছে।

কমিউনিস্ট চীনের উদ্দেশ্য কখনো এটা নয় যে, তারা শুধুমাত্র আজাদি আন্দোলনকে মিটিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হবে। বরং তাদের উদ্দেশ্য হলো খোদ ইসলাম ও মুসলিমদেরই তুর্কীস্তান থেকে মিটিয়ে দেওয়া। এ কারণেই মুসলিমদের শুধুমাত্র ইসলামের উপর চলার অপরাধে যখন টার্গেট বানানো হয়, তখন মুসলিমরা এর প্রতিবাদে আজাদি আন্দোলনে গিয়ে শরিক হয়।

এখানকার মুসলিমদের ঈমানি আত্ম-মর্যাদাবোধের প্রতি স্ব-শ্রদ্ধ সালাম জানাই। কেননা তারা সর্বযুগেই হাজারো প্রতিকূল পরিবেশ ও অমানিশার ঘোর অন্ধকারের মাঝেও শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। নিজেদের ঈমানকে তাদের কাছে বিকিয়ে দেয়নি। নিঃসন্দেহে এরা একটি আশ্চর্যজনক জীবন্ত জাতি। কেননা তারা দুশমনের অবর্ণনীয় জুলুম-নির্যাতন উপেক্ষা করে এবং নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করে ইসলামের উপর অটল ও অবিচল থেকে নিজেদের দ্বীনকে হেফাজত করেছেন।

এসকল মুসলিমরা নিজেদের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার এই পবিত্র চেষ্টা-প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা এমনভাবে অব্যাহত রেখেছেন যে, পুরো ইতিহাসে তারা একটুও পদস্খলিত হননি। পূর্বের ন্যায় এখনো তারা নিজেদের ঈমানের উপর অটল ও অবিচল রয়েছেন। তাই তো আজ তাদের মধ্য থেকেই আল্লাহর এক বাহিনী বের হয়েছে। যদের নাম "হিযবে ইসলামী আত-তুর্কীস্তানী"।

এই বাহিনী সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবত স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। হিযবে ইসলামী তুর্কীস্তানীর প্রতিষ্ঠাতাগণ ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রথম যুগেই (১৯৯৪-২০০২) স্ব-দলবলে আফগানিস্তানে হিজরত করেন এবং ইমারতে ইসলামিয়ার প্রতিরোধ-মূলক যুদ্ধে ও ইমারতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জিহাদ পরিচালনা করতে থাকেন। অতঃপর ইমারতে ইসলামিয়ার পতনের পর পাকিস্তানের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে তাদের বৃহৎ একটি অংশ জিহাদে অংশগ্রহণ করে।

তারা একদিকে যেমন আমেরিকার বিরুদ্ধে খোরাসানে মরণপণ যুদ্ধ করছিলেন, অন্যদিকে ভাবছিলেন তুর্কীস্তানী মুসলিমদের ক্ষতস্থানে পট্টি বাধা ও তাদেরকে মুক্ত করার কথা। ঠিক এমন সময় শামের নির্যাতিত মুসলিমরা সাহায্যের আহ্বান জানালেন। তখন খোরাসান, তুর্কীস্তান ও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তুর্কীস্তানী মুজাহিদরা দলে দলে সেখানে পৌঁছে গেলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উত্তম বদলা দান করুন।

কেননা উম্মতের অধিকাংশ মানুষই তো এসকল তুর্কীস্তানীদেরকে শত্রুর দয়া ও অনুগ্রহের উপর অর্পণ করে দিয়েছে। কিন্তু কখনো তারা মুসলিম জাতির কষ্টকে অন্যের কষ্ট মনে করেনি। বরং তারা উম্মতের কষ্টকে নিজেদের কষ্ট মনে করেছে। উম্মতের উম্মত হওয়ার অনুভূতি একমাত্র তাদের কাজের প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝে আসে। পৃথিবীর যে প্রান্তেই মুসলিম উম্মাহ নির্যাতিত হয়, নিজেরা মাজলুম হওয়া সত্ত্বেও সেখানে পৌঁছে যায় এবং মাজলুমানের ক্ষতস্থানে উপশম লাগিয়ে দেয়।

দুনিয়ার যে কোন প্রান্তের জিহাদ হোক না কেন! তারা তা নিজেদের জিহাদ মনে করে। জিহাদের ময়দানে কোন ধরণের কুরবানী করার ক্ষেত্রে তারা কখনো অস্বীকৃতি জানান না।

এসকল মুজাহিদীনরা যখন সিরিয়াতে জিহাদ করেছেন, তখন সেখানে অগণিত শুহাদার হাদিয়া পেশ করেছেন। শুধু তাই নয়, বরং সিরিয়ার জিহাদে বিজয় লাভ করার জন্য তারা তাদের অনেক অত্যাধুনিক অস্ত্র সরবরাহ করেছেন। তারা দায়েশের ফেতনার সময়ও আপন অবস্থায় স্থির ছিলেন। এই ফেতনায় তারা এক মুহূর্তের জন্যেও এদিক সেদিক হননি। বরং এমন প্রতিকূল সময়েও দৃঢ় থেকেছেন এবং ওলামায়ে হক্কানি-রব্বানীদের নেতৃত্বে দায়েশের বিরুদ্ধে প্রতিটা রণাঙ্গনে মোকাবেলা করেছেন।

আমি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে নিঃসংকোচে এই সাক্ষ্য দিতে পারি যে, এসকল মুজাহিদরা যেখানেই গিয়েছেন কখনো তাদের ব্যাপারে ভাল ছাড়া অন্য কিছুই শুনিনি। আলহামদুলিল্লাহ! তাদেরকে সদা সর্বদা কল্যাণেই নিয়োজিত থাকতে দেখা গিয়েছে। (আমরা তাদেরকে এমনি মনে করি। বাকি আল্লাহ-ই তাদের হিসাব গ্রহণ করবেন)

তাদের কোমল স্বভাব, উত্তম চরিত্র, শরিয়তের পূর্ণ আনুগত্য ও জিহাদের সাথে দৃঢ় সম্পর্কের কথা রণাঙ্গনের সবার মাঝে প্রসিদ্ধ। তাদের উত্তম দিকসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি দিক হলো, তারা যেহেতু নিজেদের এই জিহাদকে শরীয়তের খুঁটির সাথে বেঁধে ফেলেছেন, তাই চীনের মত বড় ভয়ংকর শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে গিয়েও নিজেদের জিহাদি সক্রিয়তা বজায় রেখেছেন। কখনো উম্মতের অন্য কোন আগ্রাসী শত্রুর খেলনার পাত্রে রূপান্তরিত হননি। (যুগের 'হুবাল' আমেরিকা, যে কিনা বিশ্ব কুফরির মাথা! তাকেও চীন নিজেদের এমন ভয়ংকর শত্রু মনে করে না, যেমনটা মনে করে এসকল মুজাহিদ ভাইদেরকে। তাই তো দেখা যায়, যখনই আমেরিকা ও চীনের মাঝে কোন ভূমির বিষয়ে পরস্পর সমঝোতা হয়, তখন এসকল মুজাহিদদের ব্যাপারে আমেরিকার সাথে ভিন্নভাবে আলোচনা পরিলক্ষিত হয়)।

আল্লাহ তা'আলা এই মুজাহিদদেরকে সাহায্য করুন। তাদেরকে হেদায়েতের পথে অবিচল রাখুন। উম্মাহর জন্য তাদেরকে হেদায়েতের কারণ বানিয়ে দিন। আল্লাহ তা'আলা উম্মতকে তাদের যথাযথ হক আদায় করার তাওফিক দান করুন। (আমীন ইয়া রাব্বিল আলামীন!)

চীনের ধারাবাহিক আক্রমণের বিপরীতে এসকল মুজাহিদদের অস্তিত্ব টিকে থাকা এবং দ্বীন-ধর্মকে বুকে ধারণ করে বেঁচে থাকার এমন প্রবল আগ্রহ, বর্তমানে মু'জেযা থেকে কোন অংশে কম নয়! তাদেরকে দেখলে জবানে অনিচ্ছায়-ই আল্লাহর শুকরিয়া জারি হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা কীভাবে এমন ঘুটঘুটে অন্ধকারের মাঝেও দ্বীনের হেফাজতের জন্য 'রিজাল' তথা মানুষ তৈরি করে দেন।

এসকল মুজাহিদদের থেকে আমরা তুর্কীস্তানের বিস্তারিত বিবরণ শুনেছি। এমন করুণ ও লোমহর্ষক ইতিহাস নিঃসন্দেহে অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করে, নয়নকে অশ্রুসিক্ত করে।

স্বীয় পাকিস্তানি সর্ব-সাধারণের মাঝে তাদের এই রক্তে রঞ্জিত ইতিহাস তুলে ধরা নিজের উপর উম্মতের ঋণ মনে করেছি। এইজন্য প্রথমে তাদের এই হৃদয়বিদারক অবস্থাদি তুলে ধরার প্রয়াস চালাবো। এবং এর উপর ভিত্তি করে বর্তমানে পাকিস্তানে বসবাসরত দ্বীনের ধারক-বাহক অভিভাবকদের উপর কী জিম্মাদারি বর্তায়, সেদিকে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

তুর্কীস্তানকে যদি ফিলিস্তিনের মত একটি সুবিশাল কারাগার বলা হয় তাহলে কোন ভুল হবে না! এসকল মুসলিমরা নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও মৌলিক অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। অথচ অন্যদিকে চীনের শিল্পায়নের উন্নতি যেন পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় সমাসীন হতে যাচ্ছে! কিন্তু তুর্কীস্তানী মুসলমানদেরকে সুপরিকল্পিত ভাবে অনগ্রসর ও অকর্মা বানিয়ে রাখা হয়েছে। যে ব্যক্তিই ইসলামের নাম নেয় এবং ইসলামের সাথে সম্পর্ক রাখে তার জন্য চাকুরী ও কর্মের সমস্ত দরজা বন্ধ।

ইসলামের সমস্ত বিধি-বিধান ও নিদর্শনাবলীর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। হিজাব ও ইসলামী পোশাক সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। একটা সময় চৌরাস্তার মাথায় ও রাস্তার মাঝে মাঝে সাইনবোর্ড লাগিয়ে হিজাব ছুড়ে ফেলার জন্য শুধু উদ্বুদ্ধ করা হতো। এবং সে সকল ব্যানারে হিজাব পরিহিতা বোনদের নিয়ে নিকৃষ্ট ভাষায় গালিগালাজ, নিন্দা ও তিরস্কার লেখা থাকত। মুজাহিদরা এসব সাইনবোর্ড এবং ব্যানারের কিছু ছবি আমাদেরকে দেখিয়েছেন। যেখানে হিজাবের বিরুদ্ধে স্লোগান লেখা ছিল। উদাহরণস্বরূপ - এক জায়গায় লেখা ছিল, 'নিজের হিজাব খুলে ফেলো যাতে সুন্দর শহরের সৌন্দর্যতা নষ্ট না হয়'। অন্য এক জায়গায় লেখা ছিল, 'হিজাব খুলে ফেলো এবং আপন চুলের দ্বারা অন্যকে আকর্ষিত কর'। এটা ছিল তিন বছর আগের অবস্থা! এখনতো মুখ ও জবানের গণ্ডি পেরিয়ে আরো ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। এখন কোথাও যদি কোন নারীকে হিজাব অথবা ইসলামী পোশাকে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তাকে এমনভাবে ধর-পাকড় করা হয়, যেমন ভাবে ধর-পাকড় করা হয় চোর, ডাকাত, গুণ্ডা ও সন্ত্রাসীদেরকে। নিরাপত্তা-রক্ষী(?) বাহিনীরা হিজাব খুলতে বাধ্য করে। যদি কোন নারী থেকে সামান্যও অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়, তাহলে তাকে জোরপূর্বক কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

এই পরিস্থিতিতে মুসলিম মহিলারা পর্দা রক্ষার্থে ঘরের ভিতর অবস্থান করাকে প্রাধান্য দিচ্ছিলেন। কিন্তু এই স্বাধীনতাও তাদের থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন সমস্ত মহিলাদেরকে বাধ্যতামূলক পুরুষদের সাথে বের হতে হয়। প্রতিটি উপশহর ও বড় গ্রামগুলোতে একটি স্টেডিয়াম নির্ধারণ করা থাকে, যেখানে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে সকল মহিলাকে পুরুষদের সাথে একত্রিত হতে হয়। এসময় তাদের অশ্লীল চীনা-পোশাক পরিধান করা আবশ্যক। নির্ধারিত সময়ের একটু আগ-পাছ হলেই সাজা ভোগ করতে হয়। মাঠে উপস্থিত হয়ে সকলকে চীনের পতাকার সামনে স্যালুট করতে হয় এবং চীনাদের জাতীয় সঙ্গীত গাইতে হয়।

মুসলিম মহিলাদেরকে জোরপূর্বক পুরুষদের সাথে একত্রিত করা হয়। তাও আবার বিশেষ এক পদ্ধতিতে। যেখানে আবাল-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী সকলকে ঢোলের তালে তাল মিলিয়ে, একজনের বাহু আরেকজনের বাহুতে প্রবেশ করিয়ে নাচতে হয়। এবং যে এসব করতে অস্বীকার করে তাকেই জেলে যেতে হয়।

রাস্তা এবং জনসমাগম স্থানে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যানার লাগানো থাকে। যেমন লেখা থাকে, 'ইসলাম মানুষের জন্য একটি নেশা'। কোথাও লেখা থাকে, 'ইসলাম আরবদের বানোয়াট একটি মিথ্যা ধর্ম'। আবার কোথাও লেখা থাকে, 'ইসলাম হলো জ্ঞান বিজ্ঞানের ঘোর শত্রু' ইত্যাদি...।

রমজান মাসে রয়েছে রোজার উপর নিষেধাজ্ঞা। রাষ্ট্রীয় নজরদারীর মাধ্যমে রমজান মাসে এই আইন বাস্তবায়ন করা হয়। প্রত্যেককে দিনের বেলা প্রকাশ্যে খাবার খেতে বাধ্য করা হয়। এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের রোজা থেকে বিরত রাখা। যাতে কেউ গোপনেও রোজা রাখতে না পারে। এসময় তাদেরকে আবশ্যকীয় ভাবে মদ এবং শুকরের মাংস খেতে হয়।

কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এর বিরোধিতা-কারীদের জন্য রয়েছে অন্ধকার প্রকোষ্ঠ। এখানে তুর্কীস্তানী মুজাহিদদের মাঝে একজন যুবক হাফেজে কুরআন ছিলেন। যে আমাদের ইমামতি করতেন। যখন কুরআনের উপর নিষেধাজ্ঞার কথা শুনলাম তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তুমি কীভাবে কুরআন মুখস্থ করলে? সে বলল, মাটির নিচে গর্ত করে লাগাতার দুইবছর সেখানে থেকে আল্লাহর কালামকে হিফজ করেছি! দিনের বেলায় সদা সর্বদা তালিবে ইলমদেরকে মাটির নিচেই থাকতে হতো। রাতে যখন অন্ধকার চারদিকে ছেয়ে যেত, তখন আমরা দু'য়েক ঘণ্টার জন্য উপরে আসতাম, দুনিয়ার একটু আলো-বাতাসের জন্য! মুজাহিদদের কথা অনুযায়ী শেষমেশ ঐ উস্তাদের খবর চীনাদের নিকট পৌঁছে যায়। এবং কুরআন শিক্ষা দেওয়ার অপরাধে (?) তাকে এখন বিশ বছরের জেল খাটতে হচ্ছে।

দ্বীনি শিক্ষার জন্য তুর্কীস্তানের বাইরে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তুর্কীস্তানের বাহিরে যে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে এখানকার মানুষের কোন ধরণের সম্পর্ক যেন না থাকে, এ ব্যাপারে বিশেষ নজরদারি করা হয়। মুসলিমদের জন্য মোবাইলে বিশেষ ধরণের এ্যাপস ব্যবহার করা আবশ্যক। যদি কারো মোবাইলে ইসলামিক কোন বিষয় পরিলক্ষিত হয় (ইসলামী কথা, ইসলামী কোন এ্যাপস) তাহলে ঐ এ্যাপসের মাধ্যমে চীনা-তদন্ত কমিটির কাছে রিপোর্ট চলে যায়। আর তারা তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করার জন্য চলে আসে।

অধিকাংশ শহর ও গ্রামে যুবকদের সংখ্যা একদম কম! আর বৃদ্ধ ও মহিলাদের সংখ্যাই বেশি। যুবকদের বেশিরভাগই আছে জেলে। মুজাহিদদের কথা অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ যুবক এখন জেলে বন্দী। এত বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য প্রশস্থ এলাকায় কয়েক কিলোমিটার বেষ্টন করে কারাগার বানানো হয়েছে। এসব জেলে কয়েদিদের থেকে শ্রমও নেওয়া হয়। এবং তাদের নিকটাত্মীয়দের সাথেও দেখা করতে দেওয়া হয় না। বর্তমানে তো কয়েদিদেরকে আদালতে নেওয়ার পরিবর্তে হত্যা করার ঘটনা অধিক পরিমাণে ঘটছে।

পুরুষদেরকে বন্দী করে মহিলাদেরকে এখন ঘরের দরজা চব্বিশ ঘণ্টা খোলা রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে চীনা-বাহিনী যখন মন চায় ঘরে ঢুকে পড়ে। এমনকি বেডরুমে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ঠিক এভাবেই মা বোনদের ইজ্জতহানির বিষয়টা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কয়েকজন বোন নিজেদের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য দেয়ালে মাথা ঠুকিয়ে ঠুকিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তাদের করুণ মৃত্যুতে চীনাদের অন্তরে একটুও দয়ার উদ্বেগ হয়নি। উল্টো এসব ঘটনা সাপ-বিচ্ছুখোর চীনা জন্তুগুলোর জন্য আনন্দ-বিনোদনের বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

প্রথমে তুর্কীস্তানী মুসলিমদের উপর দুইয়ের অধিক সন্তান প্রসবের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা ছিল। যদি দুইটি সন্তানের পর কোন মহিলা গর্ভবতী হতো, তাহলে সন্তান বা মা একজনকে হত্যা করা হতো। এটাতো ছিল পূর্বের আইন। কিন্তু এখন পনের থেকে নিয়ে পঁচিশ বছরের মেয়েদেরকে এমন ইনজেকশন দেওয়া হয়, যাতে তাদের সন্তান ধারণক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে যাতে কখনো তারা সন্তান প্রসব করতে না পারে।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, চীন এবং তুর্কীদের মাঝে ভাষা, জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতি ইত্যাদি সবদিক দিয়েই ভিন্নতা রয়েছে। চীনারা এখন মুসলিমদের এই স্বতন্ত্রতাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য উঠে পরে লেগেছে। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য স্কুলগুলোতে শুধু চীনা ভাষা এবং নাস্তিক্যবাদী সিলেবাসই পড়ানো হচ্ছে। এর থেকে স্পষ্ট হয় যে, মুসলিমদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নাস্তিক বা মুশরিক বানানোই হলো তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

মুসলিম শিশুরা যখন পাঁচ বছরে উপনীত হয়, তখন তাদেরকে তাদের মা-বাবা থেকে কেড়ে নিয়ে ঐসব নাস্তিক্যবাদী স্কুলগুলোতে ভর্তি করে দেওয়া হয়। এখানে তাদেরকে হোস্টেলে রাখা হয়। শিক্ষা-দীক্ষার সকল ব্যবস্থা চীনা-কমিউনিস্টদের হাতেই ন্যস্ত থাকে। এখানে তাদেরকে হারাম খাদ্য খাওয়ানো হয়, হারাম কাজ-কর্ম শিখানো হয়। পনের দিন পর মাত্র এক রাতের জন্য মাতা-পিতার কাছে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। এরপরেও পর্যবেক্ষণ-কারীরা তাদের পিছনে লেগে থাকে। স্কুলে ফেরার পর তাদেরকে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করা হয়। যদি বুঝতে পারে যে, তাকে ধর্মীয় কোন বিষয় বলা হয়েছে, তাহলে পিতা-মাতাকে উঠিয়ে নিয়ে শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন করা হয় এবং তাদের জীবন-যাপনকে দুর্বিষহ করে তোলা হয়।

ইসলামী নাম রাখার উপর পরিপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। সমস্ত ইসলামী নামের তালিকা করা হয়েছে। যদি কেউ এসব নামের কোন একটা রাখে, তাহলে তাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয়।

টিভি চ্যানেলগুলোতে সম্প্রচারের বড় অংশ জুড়ে ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা আবশ্যক করে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও এসব চ্যানেলে নিকৃষ্ট ধরনের মুভি...ইত্যাদিও দেখানো হয়। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এসব চ্যানেল দেখা প্রত্যেকটা তুর্কীস্তানীর জন্য আবশ্যক করে দেওয়া হয়েছে। যদি কেউ না দেখে তাহলে তাকে শাস্তি ও জরিমানার সম্মুখীন হতে হয়।

মসজিদের ইমামের দায়িত্ব হলো সে নামাজের পর মুসল্লিদের চীনা পতাকাকে স্যালুট করাবে। এরকমভাবে আজানের শব্দ পরিবর্তন করতেও চীনা সরকারের পক্ষ থেকে বাধ্য করা হচ্ছে। কিছু কিছু এলাকাতে তো আজান পরিবর্তনও করে ফেলেছে। যেখানে আজানের মাঝে "জিঞ্জিয়ানের প্রশংসা এবং চীন ও কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ" এই জাতীয় স্লোগান শামিল করা হয়েছে।

মুসলিমদের অর্থনীতি ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য তারা পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যেসব জমির দাম আগে লাখ লাখ ডলার ছিল, এখন সেগুলো দু'এক হাজার ডলারেও কেউ নেয় না।

বাহিরের রাষ্ট্রে কোন তুর্কী যুবক যদি কোনভাবে দ্বীনি ইলম শিক্ষা করতে যায়, তাহলে চীনা সরকার ঐ দেশের সরকারের মাধ্যমে তার উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। কিছুদিন আগে মিশর সরকার এমনকিছু ছাত্রদেরকে চীনা সরকারের কাছে হস্তান্তর করেছে, যারা জামেয়া-আজহারে অধ্যয়নরত ছিল। এর পূর্বে পাকিস্তান সরকারও ইলমে-দ্বীন অর্জনকারী বেশকিছু তুর্কী-ছাত্রদেরকে চীনা সরকারের কাছে সোপর্দ করেছে।

চীনারা এখানকার মুসলিমদের ঘরে দা-বটি রাখাটাও আশংকাজনক মনে করে। এজন্য প্রতিটি ঘরে একটি করে ছুরি রাখার অনুমতি দিয়েছে। তাও আবার লাইসেন্স করা! এই ছুরিটা ঘরের নির্দিষ্ট স্থানে শিকল দিয়ে বাঁধা থাকে, যাতে কেউ নিজের আত্মরক্ষায় এটাকে ব্যবহার করতে না পারে। এই রকমই পদ্ধতি বিভিন্ন হোটেল ও কসাইখানা গুলোতে!

তুর্কীস্তানের ভূখণ্ড থেকে মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করা এবং সেখানে চীনা নাস্তিকদের আবাস তৈরি করা, এগুলো চীনের জাতীয় অ্যাকশান প্লানেরই একটা অংশ। এই উদ্দেশ্যেই মুসলিমদের জোরপূর্বক চীনে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে এবং তাদের স্থানে চীনাদের বসবাস করানো হচ্ছে। খোদ পাক-চীনা সরকারের যৌথ অর্থনৈতিক চুক্তি সিপিইসি-কে এই কাজেই ব্যবহার করা হচ্ছে। পাক-

চীনা সরকারের যৌথ চুক্তির এটাও একটি প্রজেক্ট, যে তারা তাদের মিল ফ্যাক্টরিগুলো পূর্ব তুর্কীস্তানে স্থানান্তরিত করবে এবং এসব প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারীরা হবে চীনা নাগরিক। এত বিপুল সংখ্যক চীনা কর্মচারীদের বসবাসে এখনকার মুসলমানরা সংখ্যাগুরুর পরিবর্তে সংখ্যালঘু জাতিতে পরিণত হবে।

তুর্কীস্তানী মুসলিমরা বর্তমানে তিন ভাগে বিভক্ত

বড় একটি অংশ যারা নিজেদের দ্বীন-ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভালবাসে। এই শ্রেণির লোকদের বুকভরা আশা যে, একদিন না একদিন এই নির্যাতনের ধারা শেষ হবেই। তারপর তারা পুনরায় স্বাধীন-ভাবে নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারবেন। তারা এই স্বাধীনতার মুখ দেখার জন্য নিজেদের প্রিয়জনদেরকে নিজ হাতে তুর্কীস্তানের বাইরে জিহাদের ভূমিতে পাঠিয়ে দেন। আলহামদুলিল্লাহ! জিহাদের ময়দানে এসব মুহাজিরদের সংখ্যা উল্লেখ করার মতো। এসব মুহাজিরদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো খুবই বেদনাদায়ক। কখনো দেখা যায় স্বামী এখানে তো স্ত্রী তুর্কীতে; আবার ছোট বাচ্চারা এখানে তো মা-বাবা আছে ওখানে। তুর্কীর মা-বাবারা নিজেরাই নিজেদের আদরের সন্তানদের কারো না কারো মাধ্যমে জিহাদের ময়দানে পাঠিয়ে দেন।

এইরকম এক ভাইয়ের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। যখন তিনি হিজরত করতে চাইলেন, তখন তার স্ত্রী কোন কারণ-বশত হিজরত করতে পারেননি। কিন্তু তিনি তার পাঁচ বছরের সন্তানকে বাবার কোলে তুলে দিয়ে কেঁদে কেঁদে বললেন, আপনি তাকে সাথে নিয়ে যান; যাতে কমপক্ষে সে তার দ্বীনকে হেফাজতে করতে পারে। এই শিশুটি চারটি বছর ধরে মাকে ছাড়াই হিজরতের ভূমিতে অবস্থান করছে। এই ভাই-বোনেরা কী পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করে যে এখানে পৌঁছেছেন; আর কত কষ্ট সহ্য করে যে এই পাহাড়-পর্বতে অবস্থান করতেছেন! তা বলার অপেক্ষা রাখে না!

আহ! আমাদের পাকিস্তানি ভাই-বোনেরা যদি দ্বীনের প্রতি এমন আন্তরিক ভালবাসা কখনো দেখতে পেতেন! ধর্ম ও বিশ্বাসের কী মূল্য তা এসকল ভাই-বোনদের দেখলেই বুঝা যায়। এই ছিল প্রথম শ্রেণি, যারা স্ব-শরীরে জিহাদ করেন বা যেকোনো ভাবে জিহাদের সাথে সংশ্লিষ্টতা রাখেন।

দ্বিতীয় শ্রেণি হলো, যারা চীনাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তুর্কীস্তান বা মালয়েশিয়া গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এটা সবারই জানা যে, এই (অপশনে) চীনের যেমন লাভ রয়েছে তেমনি তুর্কীস্তানেরও যথেষ্ট স্বার্থ রয়েছে। তাই তো তারা পরস্পরকে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করে!

আর তৃতীয় শ্রেণি হলো যারা নিজেদের দ্বীন-ধর্ম, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়কে জলাঞ্জলি দিয়ে চীনাদেরকে সন্তুষ্ট করার ব্যর্থ চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এসব লোক চীনাদের দয়া ও অনুগ্রহের পাত্রে পরিণত হয়েছে। এই শ্রেণির লোকদেরকে সাধারণত তুর্কীস্তানের পরিবর্তে চীনের বিভিন্ন জায়গায় বসবাসের সুযোগ দেওয়া হয়।

মানবাধিকার সংস্থাও তাদের এই অবস্থানের কথা স্বীকার করে। এবং কিছুদিন পর পর তাদের সংবাদ সারা বিশ্বের সামনে পরিবেশন করে থাকে।

তাদের এই রিপোর্ট তো তথ্য-ভাণ্ডারের তথ্যে সমৃদ্ধি করে! কিন্তু তুর্কীস্তানের মুসলিমদের উপর চলা নির্যাতন ও নিপীড়নের মাত্রাকে তিল পরিমাণও কমায় না। মানবাধিকারের পতাকাবাহী দেশগুলোই যেহেতু তাদের কথিত মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত আছে, তাই তুর্কীদের ব্যাপারে তাদের মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন মনে করেন না। তাদের কাছে এগুলো কেবল রাজনৈতিক পলিসি যা কোন সমস্যা নয়। মিডিয়ায় উঠে আসা এসব রিপোর্ট মুসলিম দেশের নামধারী শাসকদেরকে একটুও ভাবায় না। তারা আগ বাড়িয়ে চীনের কাছে কোন অভিযোগ করা তো দূরের কথা, এদের নিয়ে রাজনৈতিক কোন স্বার্থ হাসিল করারও প্রয়োজনবোধ করে না। এসকল শাসকেরা শুধু চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতেই ব্যস্ত। অন্য কোন বিষয়ে তাদের চিন্তা-ভাবনাও নেই।

আমরা পাকিস্তানিরা তো তুর্কীস্তানী মুসলিমদের প্রতিবেশি। তুর্কী ভাইদের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, তাদের ক্ষতস্থানে উপশমের পট্টি বেধে দেওয়া অন্যদের তুলনায় আমাদেরই আগে করা উচিত। তাদের সাহায্যার্থে ছুটে যাওয়ার ফরজিয়্যাত আমাদের উপরই আগে বর্তায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো অন্যদের তুলনায় চীনের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্কই সবচেয়ে বেশি! চীনকে বলা হয় "ডুবে যাওয়া পাকিস্তানি অর্থনীতির বড় সাহায্যকারী"। পাকিস্তানকে ঋণ দেওয়ার কারণে চীনকে আমেরিকার চাইতেও ভাল বন্ধু

মনে করা হয়। এটা এমন একটি আত্ম-প্রবঞ্চনা যা বাস্তবতা উপলব্ধি করতে এবং নিজের অধিকার আদায় করতে বাধা প্রদান করে।

বাস্তবতা হলো, এশিয়া থেকে আফ্রিকা পৃথিবীর যে দেশ-ই চীনের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে সে দেশেরই অর্থনীতির শোচনীয় অবস্থা হয়েছে। অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নত হওয়া তো দূরের কথা, পূর্বের অবস্থাই ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। বরং সেখানকার অর্থনীতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। এরা যেখানেই আগমন করেছে সেখানকার অর্থনীতিকে নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নিয়েছে। শুধু অর্থনীতি-ই নয় সেখানকার সভ্যতা-সংস্কৃতিকেও পাল্টে দিয়েছে। বর্তমানে পাকিস্তানেও অর্থনৈতিক উন্নতির(?) একটা চীনা-চাল আছে যার কারণে মুসলমানদের প্রতি চীনের ঘোরতর শত্রুতা দেখার পরেও নীরবতা পালন করা হচ্ছে।

মরীচিকার পেছনে পরা এসব সরকার ও জেনারেলদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই। কেননা তাদের দ্বীন-ধর্ম ও মন-মস্তিষ্ক হলো পেট ও অভিলাষের গোলাম। তারা দুনিয়ার এই হীন স্বার্থের জন্যই মূলতঃ বেঁচে থাকে। নিজের স্বার্থ-রক্ষার্থে তারা পানিতে ডুবে মরতেও প্রস্তুত। তাদের প্রতি না আছে কোন আশা, না কোন অভিযোগ।

বরং আমার সমস্ত অভিযোগ ঐ সমস্ত লোকদের প্রতি যারা নিজেদেরকে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দেওয়া ও তাদের কর্ণধার হওয়ার দাবী রাখে! যাদের দিকে সাধারণ মুসলিমরা তাকিয়ে থাকে এবং যাদের মুখের কথা শুনতে সবাই উন্মুখ হয়ে থাকে। কিন্তু আফসোস! তারাও আজ ঐ সব ধর্মদ্রোহী জেনারেলদের বুলি আওড়িয়ে অনুভূতিহীন হয়ে বসে আছেন। ঐ সকল দা'ঈদের জন্য বড় দুঃখ হয়। কারণ তাদের কাজই ছিল দ্বীনের ঐ সকল বিষয়গুলো জীবন্ত রাখা, যেগুলোকে যুগের ফিরআউনরা মাটি-চাপা দিতে বদ্ধপরিকর। ধর্মদ্রোহী জেনারেলদের বেতন-ধারী বুদ্ধিজীবীরা যদি হক্ব ও বাতিলকে উল্টে ফেলে, সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্যে রূপান্তরিত করে এবং জুলুমকে ন্যায় হিসেবে মানুষের সামনে তুলে ধরে, তাহলে সত্য বিষয়গুলো মানুষের সামনে স্পষ্ট করার দায়িত্ব কাদের উপর বর্তায়?

এই আক্রমণ ও যুদ্ধের সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে জাগ্রত করে তোলা কাদের দায়িত্ব? সাধারণ মানুষের নাকি দ্বীনের ধারক-বাহকদের?

ধর্মীয়-নেতাদের বৈশিষ্ট্য তো এটা নয় যে, তারা নিজ স্বার্থ ও প্রচলিত হিকমতের চশমা দিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন। বরং দ্বীনের ধারক বাহকদের বৈশিষ্ট্যই হলো ঈমানের আলোতে অবস্থা বিশ্লেষণ করা এবং ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও উম্মাহকে সঠিক পথের দিশা দেওয়া। বড় দুঃখ লাগে, আমাদের অধিকাংশ দা'ঈরাই আজ উম্মাহর ক্ষতস্থানের ব্যথা অনুভব করেন না। উপশমের ব্যবস্থা তো দূরের কথা, উম্মাহর দুঃখ-দুর্দশার ঘটনাগুলো পর্যন্ত মানুষের সামনে উপস্থাপন করতেও সাহস করেন না।

দ্বীনের জন্য আত্মোৎসর্গকারী হে পাকিস্তানি ভাইয়েরা!

প্রথমত, আমাদের উচিত হলো মজলুমদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, তাদের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া এবং তাদের কষ্টগুলোকে অকপটে স্বীকার করে নেওয়া। জালিমের অত্যাচার থেকে আমাদের মা-বোনকে রক্ষা করার প্রথম পদক্ষেপ হলো, তাদের ইজ্জত লুণ্ঠনকারীদের প্রতি মনে প্রাণে ঘৃণা পোষণ করা। সকল নির্যাতিত মুসলিমরা আমাদের এক দেহের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা পৃথিবীর যে দেশেই বসবাস করুক না কেন তাদের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, তাদের দুঃখে দুঃখিত হওয়া প্রকৃত ঈমানের দাবী।

জালিমকে প্রতিহত করা এবং মজলুমদের অশ্রু মুছে দেওয়া আমাদের উপর ওয়াজিব। নিজের অত্যাচারিত বোনের আহ্বান শুনেও সাড়া না দেওয়া এবং তাদের সাহায্যার্থে উঠে না দাঁড়ানো, এ যেন আল্লাহর আজাবকে টেনে আনার-ই শামিল।

কাজে থাকুক বা অবসরে, আনন্দে থাকুক বা বেদনায় - সর্বাবস্থায় সাহায্যপ্রার্থী ভাই-বোনদের সাহায্য করা ফরজে আইন। কিন্তু কি বলব! আমরা যারা নিজেদেরকে দ্বীনদার বলে দাবী করি, তাদের কাছেও তো এসব ফরজ ও বুনিয়াদি বিষয়গুলো জাতীয়তাবাদের সামনে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। দ্বীনের ধারক বাহকদের উপর ফরজ ছিল দেশপ্রেম আর দেশাত্মবোধের মূর্তি-পূজার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করা। কিন্তু আফসোস! তারা আজ স্পষ্ট করার পরিবর্তে উল্টো যতটুকু পার্থক্য ছিল তাও নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছেন। আজ দেশপ্রেমের নামে দেশকে পূজা করা হচ্ছে। জাতীয়তাবাদের ধর্মদ্রোহী জেনারেলদের স্বার্থ রক্ষা করা হচ্ছে।

(বাস্তবতা তো এটাই যে, ইসলাম ও মুসলিম এবং পুরো উম্মাহর সামনে দেশ ও রাজনীতির এই বুলি আওড়ানো হচ্ছে।) পাকিস্তান থেকে সৌদি আরব পর্যন্ত সারাবিশ্বের মুসলিম শাসকদের একই অবস্থা।

জাতীয়তাবাদের শিরোনামের সাথে উম্মতের গাদ্দার জেনারেল ও জালিম শাসকদের ব্যক্তিগত ও বংশীয় স্বার্থই শুধু জড়িয়ে আছে। অন্য কিছু নয়।

তুর্কীস্তানী মুসলিমরা এই উম্মাহরই একটি অংশ। তাদের সাথে আমাদের বন্ধন তেমনই যেমন বন্ধন কাশ্মীরীদের সাথে। তাদের সাহায্য করা এবং তাদেরকে জুলুমের হাত থেকে মুক্ত করা আমাদের উপর তেমনই ফরজ যেমন ফরজ কাশ্মীরী জনগণের প্রতি সাহায্য সহযোগিতা করা ও তাদেরকে জুলুমের হাত থেকে বাঁচানো।

কিন্তু আফসোস! আমরা আজ নিজেদের দেশের মধ্যেই উম্মাহকে সীমাবদ্ধ মনে করি; তাও আবার বিপদের সময় ছাড়া। একবার যখন মানুষ নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় তখন তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। কালের পরিক্রমায় আরেকটি বিষয় বৃদ্ধি পেয়েছে— আমরা ঐটাকেই দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা মনে করি, যা ধর্মদ্রোহী মুনাফিক জেনারেলরা আমাদেরকে বুঝিয়ে থাকে। ফলে উন্নতির নামে ইসলামের শত্রুদেরকে এদেশে অংশীদারিত্ব দেওয়া হচ্ছে। তারা দিন দুপুরে পাকিস্তানিদেরকে হত্যা করে বেতন নিয়ে নিরাপত্তার সাথে চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ মুসলিমদের জন্য পাকিস্তান নামক এই দুর্গে কোনই ঠাই হচ্ছে না। দ্বীনের দায়ীগণ কেন বুঝতেছেন না যে, এখন সম্পর্ক-স্থাপনের ভিত্তি হিসেবে "আল্লাহ ও তার রাসূলের (সা.) মোহাব্বত"কে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে না। বরং এখন সম্পর্ক-স্থাপনের ভিত্তি হলো স্বার্থবাজ জেনারেলদের নির্ধারণ করা "রাষ্ট্র-উন্নতি"।

কাশ্মীরী মুসলিমদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে এখানে সভা সমাবেশ হয়; র‍্যালি বের করা হয়। আচ্ছা বলুন তো! কাশ্মীরীদের সাথে আমাদের সম্পর্ক কীসের? আমরা কেন তাদের পক্ষে স্লোগান দিচ্ছি? (আমরা যতটুকু করছি অবশ্যই তা করা জরুরি ছিল; বরং এর চেয়ে আরও বেশি করা জরুরি, কিন্তু আমাদেরকে তা করতে দেওয়া হচ্ছে না) কিন্তু কী কারণ রয়েছে যে, কাশ্মীরীদের মত আমাদের একদম নিকটবর্তী তুর্কীস্তানীদের দুঃখ কষ্ট দেখার পরও আমরা তামাশার ছলে তাকিয়ে আছি?

হ্যাঁ! তামাশাই বললাম; এটা নীরবতা নয়। চক্ষু খোলা রেখে মন-মস্তিষ্কে তালা দিয়ে নির্যাতনকারীদের সাথে বন্ধুত্বের ঢাক-ঢোল বাজাচ্ছি! তুর্কীস্তানীরা কি মুসলমান নয়? তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা কি ফরজ নয়? আমাদের এই নিকৃষ্ট আচরণের কারণে কি আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হতে হবে না? নাকি আই.এস.পি.আর. থেকে যাদের সার্টিফিকেট এসেছে তারাই শুধু মুসলিম! নাকি যতটুকুর অনুমোদন রাজনীতি নামক ধর্ম এবং এ ধর্মের প্রভু জেনারেলরা দিয়ে থাকে ততটুকুর মধ্যেই উম্মাহর গণ্ডি সীমাবদ্ধ?

হে আমার ভাইয়েরা!

এটা শুধু তুর্কীস্তানী মুসলিমদের বিষয় না বরং বিষয় তো এখানে প্রিয় ইসলামের! যেই ইসলাম ধন-দৌলত, সন্তান-সন্তানাদি ও নিজের জীবন থেকে বেশি প্রিয়। কে এই কথা অস্বীকার করবে যে, তুর্কীস্তানী মুসলিমদের সাথে চীনের শত্রুতা একমাত্র ইসলামের কারণে নয়! এখন যারা পাক-চীন বন্ধুত্বের ঢাক-ঢোল পিটায় তাদের কাছে প্রশ্ন হলো, ইসলামের সাথে চীনের এমন শত্রুতা কি পাকিস্তানি মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্বের কারণে পরিবর্তন হয়ে যাবে? (শত্রুতা কি বন্ধুত্বে পরিণত হবে?) বর্ডারের ওপারে আল্লাহ ও তার রাসূলের শত্রু কি বর্ডারের এ পারে এসে বন্ধু হয়ে যাবে? এ বিষয়ে আমাদের নিকটে অসংখ্য প্রশ্ন আছে।

এরপরেও আলহামদুলিল্লাহ! এখানে কুরআন হাদিসের শিক্ষার ধারাবাহিকতা জারি আছে এবং দরস-তাদরীসের দ্বারা মসজিদ মাদরাসাগুলো জীবন্ত আছে। এখানে ইসলামী বিজয়ের ধারাবাহিকতা কোন না কোন ভাবে জীবন্ত আছে। এখানকার সাধারণ মানুষের মাঝে জিহাদের ভালবাসা, আল্লাহ ও তার দ্বীনের জন্য কুরবান হওয়ার আগ্রহ উদ্দীপনা এই অধঃপতনের সময়েও আলহামদুলিল্লাহ নিঃশেষ হয়ে যায় নি। পাকিস্তানিদের পারস্পরিক মোহাব্বত-ভালবাসা ও হৃদ্যতা কে এখনও ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়। আলহামদুলিল্লাহ! সবচেয়ে বড় কথা হলো এখনও আল্লাহ ও তার রাসূলের সম্মান রক্ষার্থে জীবন উৎসর্গকারী বীর পুরুষগণ

বিদ্যমান রয়েছেন। চীনের মত ভয়ংকর শত্রু ও হিংস্র প্রাণীদের পতাকাবাহীরা সংস্কৃতির নামে আমাদের দেশের এমন সৌন্দর্য-মণ্ডিত বিষয়গুলো কি ঠাণ্ডা পেটে হজম করতে পারবে?

চীনারা ভালো ভাবে জানে যে ইসলাম তাদের সংস্কৃতিকে কখনো মেনে নেবে না। তাদের নিকৃষ্ট সংস্কৃতি ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাদের ঠিকই জানা আছে যে, একটি হলো আগুন এবং আরেকটি হলো পানির মতো।

এ দুইয়ের মাঝে সামান্য একটি বিষয়েও সামঞ্জস্যতা নেই। এই কারণেই এখন তাদের লক্ষ্য শুধু ব্যবসা নয়। এখানে তাদের সৈন্যদের অবস্থান করানো, চীনা ভাষা শিখানো, চীনা রীতিনীতির প্রচলন করা, চীনা মুভির ডাবিং করা, চীনা স্কুল-কলেজের আধিক্যতা অর্জন করা, সেবার নামে চীনা মেয়েদের চাকুরীর সুযোগ করে দেওয়া ইত্যাদি।

মোটকথা, দেশ ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য তারা সর্বদিক দিয়ে আগ্রাসী আক্রমণ পরিচালনা করছে। কোন দিকই বাদ রাখছে না। এসকল পরিমণ্ডলে চীনাদের অনুপ্রবেশকে কেউ যদি শুধু ব্যবসা ও অর্থনীতির চোখে দেখে, তাহলে তার চক্ষু ডাক্তার দেখানো ছাড়া উপায় নেই।

আমরা মানি বা না মানি এটা অবশ্যই ইসলামের বিরুদ্ধে চীনাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। যেভাবে ইংরেজরা ব্যবসার (ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি) রূপ ধারণ করে প্রথমে দেশের শাসন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। অতঃপর দেশের শিক্ষা-দীক্ষা, নিয়ম-কানুন সবকিছুই নিজেদের হাতে নিয়ে ফেলেছ। অবশেষে তারা পুরো দেশকে নিজেদের হাতে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে নিজেদের জন্য এক নতুন প্রজন্মের রূপ দিয়েছে। ঠিক একইরকম ভাবে ব্যবসা ও অর্থনীতির সাহায্য সহযোগিতার নাম দিয়ে নতুন এক ষড়যন্ত্রের জাল ফেলা হয়েছে। এখন পাক-চীন চুক্তির মাধ্যমে উন্নতি ও অগ্রগতির কোন বালাই নেই, বরং এতে উন্নতি ও অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হচ্ছে। এবং এই মহাসড়ক দিয়েই চীনা নাস্তিকতা ও নিকৃষ্ট চীনা-সংস্কৃতি চলে আসছে।

দ্বীনের ধারক-বাহকদের নেতৃত্বদানকারী সম্মানিত ওলামা মাশায়েখগণ!

অবস্থা ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। নিজেদের উপর অর্পিত ফরজ বিষয়গুলো অনুধাবন করুন। এটা আমাদের জাতি, ধর্ম ও সভ্যতার উপর আক্রমণ। শুধু এতটুকুই পার্থক্য যে, যুদ্ধ হয় ঢাল তরবারির দ্বারা, আর তারা করছে অর্থ ও মিডিয়া দ্বারা। দেখুন এই যুদ্ধ বোঝা ও বুঝানো কোনটাই কঠিন কোন ব্যাপার নয়। তাদের এক হাতে যেমন আছে পাকিস্তানিদের জন্য সাহায্য সহযোগিতার পতাকা তেমনি অন্য হাতে আছে বিষ-মিশ্রিত ধারালো খঞ্জর। যা তারা তুর্কীস্তানী মুসলিমদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। সুতরাং আমাদের নীরবতা ভাঙ্গতে হবে। যদি আমরা নীরব থাকি তাহলে —আল্লাহ মাফ করেন— আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ক্ষমা করবেন না। ইতিহাসও আমাদেরকে কখনো ছাড় দিবে না।

আর এটাও স্মরণ রাখা চাই যে মুসলমানদের জন্য ঐ সম্পদ কখনো কল্যাণ বয়ে আনবে না যার ভিত্তি হলো - আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও আপনজনদের রক্ত। জেনারেলরা তাদের সৈন্য দেখিয়ে যতই আপনাকে ধোঁকা দিক না কেন, বাস্তবতা এটাই যে, চীনা অর্থনীতির এই কুমির আমাদের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ গিলে ফেলবে। তারা আমাদের সাহায্য করা তো বহু দূরের কথা, আজ তাদের কারণেই আমাদের অর্থনীতি এবং আগামী ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ব্যবসায়ীরা দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। আর মিল ফ্যাক্টরিগুলোও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চীন যদি আমাদের অর্থনীতিকে সহায়তা করে থাকে, তাহলে সেই সহায়তা এই যে, তারা আমাদের অর্থনীতিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ফেলেছ।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার!

আপনারা শুধু চীনা চুক্তির উপর বগল-বাজদের মুখরোচক কথাই শুনেছেন! দয়া করে একবার হলেও তাদের চুক্তির বিস্তারিত বিষয়গুলো পড়ে দেখুন। এর মধ্যে কোনটা সবচাইতে বড় প্লান যা আপনাকে এই বন্ধু নামের শত্রু উপহার হিসেবে দিচ্ছে?

অদূর ভবিষ্যতে তারা আমাদের সমুদ্র দিয়েই সারা বিশ্বে ভ্রমণ করবে এবং তার জন্য রোড ও সেতুর টোল ভাড়াও আমাদেরকেই দিতে হবে। আমাদের ভূমি দিয়ে তাদের ব্যবসায়ী কাফেলা অতিক্রম করবে। উচিত তো ছিল এর বিনিময়ে আমারা তাদের থেকে পয়সা নিব। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো তাদের যাতায়াত খরচটাও ঋণের নামে আমাদেরই পরিশোধ করতে হবে।

এরপর তাদের দেওয়া ঋণের যে সুদ আসবে তাও একটু চিন্তা করবেন। তাহলেই চীনাদের এই বন্ধুত্বের প্রকৃত চেহারা উন্মোচিত হয়ে যাবে।

হে সম্মানিত ভাই ও বন্ধুরা!

দেখুন আপনাদের এই তুর্কীস্তানী মুসলিম ভাইয়েরা এমন ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যেও ইসলামের জন্য জীবন কুরবান করে যাচ্ছেন। তাদের নারী-পুরুষরা হিজরত ও জিহাদের কঠোরতা মেনে নিয়ে শত-সহস্র কষ্টের মাঝেও নিজেদের দ্বীনকে হেফাজত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এসকল ভাই-বোনেরা আপনাদেরকে চীনের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে বলছে না। বরং তাদের পক্ষ থেকে একটাই আবেদন তা হলো, আপনারা ইসলামের সাথে চীনের শত্রুতার মুখোশ উন্মোচন করবেন। ইসলামের সাথে শত্রুতা ও মুসলিম নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিজ নিজ জায়গা থেকে আওয়াজ তুলবেন— চীন জালিম, অত্যাচারী এবং ইসলামের ঘোরতর শত্রু! এই জুলুমকে কখনো ইনসাফ বলবেন না। তাদের বন্ধু নয় শত্রু মনে করুন।

আর উম্মতের এক নাম্বার শত্রু আমেরিকার পলায়ন করা কেবল খাতা কলমেই বাকি। আপনাদের সাহায্য ও মুজাহিদদের কুরবানির বিনিময়ে অতিশীঘ্রই নবদিগন্তের সূচনা ঘটবে ইনশাআল্লাহ। আফগানিস্তানে ইতিমধ্যে শরিয়াহর বাতাস বয়তে শুরু করেছে আলহামদুলিল্লাহ!

ঠিক এমন পরিস্থিতিতে পলায়নরত শত্রুকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে আসা কেমন বুদ্ধিমানের কাজ, যেই হাত রঞ্জিত হয়েছে আপনজনের তাজা রক্তে? চীনও শত্রু; তাকে শত্রুর নজরেই দেখতে হবে।

গাদ্দার জেনারেলরা সর্বপ্রথম আমেরিকার হাত ধরেছিল। তাকে মালিক ও মুনিব বানিয়ে রেখেছিল। এই জেনারেলরাই তো মুসলিমদের হত্যাকারী আমেরিকাকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানে আক্রমণ করার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল। যার কারণে তারা আল্লাহর ওলীদেরকে হত্যা করেছে এবং সাধারণ মানুষের উপর বারুদ-বৃষ্টি বর্ষণ করেছে। এখন আমেরিকা তাদের কাছে ডলারের হিসাব চাওয়া শুরু করেছে, তাই তারা চীনের দিকে হা করে তাকানো শুরু করেছে। আমেরিকার সামনে নত করা মাথা এখন চীনের পূজা শুরু করেছে। এভাবেই এই গাদ্দারেরা প্রিয় ভূমি পাকিস্তানকে বিক্রির করার জন্য চীনের হাতে তুলে দিচ্ছে।

আমার সম্মানিত ভাইয়েরা!

আমেরিকা ও চীন উভয়েই মুসলিমদের হত্যাকারী ও চরম শত্রু। এই শয়তানদের মোকাবেলায় আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে এবং আল্লাহর রুজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। আল্লাহর শপথ! তুর্কী মুসলিমদের সাহায্যার্থে আপনি যদি শুধু আওয়াজটুকুও উঁচু করেন, তাহলেই তুর্কীতে বসবাসরত আমার মা-বোনদের কলিজা ঠাণ্ডা হবে। তাদের আবরুর হেফাজত হবে ইনশাআল্লাহ।

তারা নিজেরা নিজেদেরকে শত দুঃখ বেদনার মাঝেও মুসলিম উম্মাহর একটি অংশ মনে করবে। আপনি যদি চীনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঁচু করেন, তাহলে শুধু তুর্কী মুসলিমদেরই উপকার হবে না! বরং এটা পাকিস্তানি মুসলিমদের ধর্ম, স্বাধীনতা ও অর্থনীতিরও হেফাজত হবে ইনশাআল্লাহ।

আপনাদের কাছে শুধু এটাই নিবেদন যে, আপনারা আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব স্থাপন করুন এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করুন। এটা ঈমানের অন্যতম একটি ভিত্তি। এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন কু-ধারণা পোষণ করবেন না। আল্লাহর শপথ তিনি তার বান্দাদের সাহায্য করতে সক্ষম। তিনি শক্তিশালী এবং শাস্তিদাতা। সুতরাং ঐ মহা-মহীয়ান আল্লাহর আদেশ মেনে চলুন। চীনাদের নিপীড়নে অতিষ্ঠ মুসলিমদের দুঃখ কষ্টের ঘটনাগুলো এবং তাদের দ্বীনের জন্য কুরবানির বৃত্তান্তগুলো মানুষের সামনে বর্ণনা করুন। লোকদেরকে দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে জাগ্রত করে তুলন। কেননা মনে রাখবেন, শত্রুকে শত্রু হিসেবে জানা-ই হলো যুদ্ধের প্রথম পদক্ষেপ। অন্তত প্রথম পদক্ষেপটি গ্রহণ করুন। নিজের জাতি ও আগামী প্রজন্মকে এই রণাঙ্গনের জন্য প্রস্তুত করে তুলন।

আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন কাশ্মীর, তুর্কীস্তান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান সহ সকল মাজলুমানকে সাহায্য করেন। আল্লাহ তা'আলা পাকিস্তানি মুসলিমদের সকল বিপদ-মুসিবত থেকে রক্ষা করুন। পাকিস্তানকে ইসলাম এবং মুসলমানদের অপরাজেয় দুর্গে রূপান্তরিত করে দিন। আমাদেরকে বন্ধু ও শত্রুর পরিচয় লাভ করার তাওফিক দান করুন। আমীন ইয়া রাব!

****